'বুদ্ধের ভাষা'

গ্রন্থকার

ভিক্ষু সত্যপাল

BUDDHA INTERNATIONAL WELFARE MISSION
P. O.- Buddha-Gaya, Box no -04, 824231,
Dist-Gaya, Bihar, India. Mob: 0091-9430442804.

গ্রন্থ-শীর্ষক : বুদ্ধের ভাষা

গ্রন্থকার : অধ্যাপক ডঃ ভিক্ষু সত্যপাল

প্রকাশক : বি. আর্য্যপাল ভিক্ষু
সাঃ সম্পাদক, বুদ্ধ ইন্টারন্যাশনাল ওয়েলফেয়ার মিশন

প্রকাশনায় : BUDDHA INTERNATIONAL WELFARE MISSION

প্রকাশ-কাল : ০৯-০২-২০০৯, শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার মহোদয়ের ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র, চতুর্থ সংঘরাজ পদে অভিষিক্ত হওয়ায়, অভিনন্দন স্বরূপ এই প্রকাশনা।

সংস্করণ : প্রথম, ১০০০ কপি

কম্পোজিং : শ্রী সরিৎ বড়ুয়া

কপি-রাইট : গ্রন্থকার (সর্বাধিকার)

প্রাপ্তিস্থান International Meditation Centre,
P. O. Buddhagaya, Dist. Gaya (Bihar) .
Pin. 824231, Tel. & Fax No. 0631-2200707

অস্থায়ী বাসস্থান: C-2 (29-31) Chatra Marg University of Delhi
Delhi – 110007 (India) Tele: 011 – 27667003
Email: bhikshusatyapala@live.com
buddhatriratnamission@yahoo.com

সুলভ মূল্য : শ্রদ্ধাদান

Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

সমর্পন-পত্র

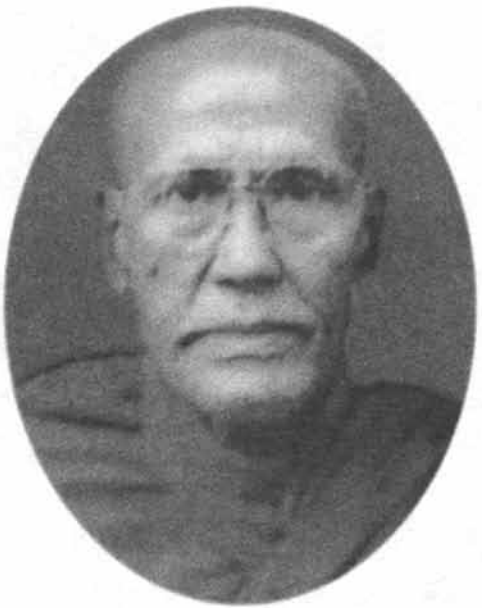

'বুদ্ধের ভাষা'
শীর্ষক গ্রন্থটি
আমার পরমরাধ্য উপাধ্যায়, ভারতীয় সংঘরাজ
ভিক্ষু মহাসভার প্রাক্তন তৃতীয় সংঘরাজ,
অগ্রমহাসদ্ধর্মজ্যোতিকাধ্বজ, বিদর্শনাচার্য,
ড. রাষ্ট্রপাল মহাথের মহোদয়ের

স্মৃতি-রক্ষার্থে
সমর্পিত হল
।
গ্রন্থকার
ভিক্ষু সত্যপাল

প্রকাশকের আবেদন

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার
আজিও জুড়িয়া অর্ধজগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যার।
(কবি দ্বিজেন্দ্রলাল)

বৌদ্ধ ধর্মের বৈশিষ্ট্যের জন্যে ভারতে সর্বধর্মের মধ্যে একমাত্র বৌদ্ধ ধর্মই সম্রাট অশোকের বদান্যতায় এক সময় পূর্ব জাপান হতে পশ্চিমে আমেরিকা পর্যন্ত প্রায় অর্ধ জগতে প্রচারিত হয়েছিল। বর্তমানে পশ্চিম বিশ্বে স্যার এডুইন আরনল্ড এর Light of Aisa পুস্তকটি অধ্যয়নের ফলে এবং ড. বি. আর আম্বেদকর, দলাই লামার বিশেষ অবদানের জন্য হাজার হাজার মানুষ তথাগত বুদ্ধের শিক্ষা গ্রহন ও অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের মহামূল্যবান জীবনকে সার্থক করে যাচ্ছেন। অথচ আমরা বড়ুয়া'রা মহামতি বুদ্ধের পরম্পরা বৌদ্ধ হয়েও অনেকে (বিশেষত ভারতে) এখনও **"বুদ্ধ" কে?** সত্যিকারভাবে বুঝা বা বুদ্ধের শিক্ষাকে যথার্থভাবে নিজেদের জীবনে আচরণ-অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেনি। অপসংস্কৃতির সাথে মিশে নিজেদের সংস্কৃতি ভুলে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি বিবেচনা করি তাহলে বুঝতে পারি বুদ্ধের মতো একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, জ্ঞানী, পণ্ডিত, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, পরিত্রাণত্রাতা, ভগবান বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে আর নেই। অথচ এতসব অপ্রমেয় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান-ধ্যান শিক্ষার জন্য কয়জন মাতা-পিতা নিজেদের তথা ছেলে-মেয়েদের জন্য ধর্মবই সংগ্রহ করে নিজেরা পড়া-অনুশীলন এবং ছেলে-মেয়েদের ও সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্ম শিক্ষার জন্য বলা বা উৎসাহ প্রেরণা দিচ্ছেন? বুদ্ধের শিক্ষা গ্রহন কিংবা অনুশীলন কেন করবেন তার ব্যাখ্যা দিতে গেলে লেখা অনেক বেড়ে যাবে। শুধু একটু বিবেচনা করুন কেন বিখ্যাত কবিরা উপরের দু'লাইন এবং নীচের কবিতা রচনা করেছেন?

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোরকুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী
কর'ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃত বাণী,
বিকশিতকর, প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পূণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।
(বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার মহামান্য চতুর্থ সংঘরাজ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালযের অধ্যাপক, মায়ানমার সরকার কর্তৃক অগ্গমহাপণ্ডিত উপাধিতে ভুষিত, আমার গুরুভাই ড. সত্যপাল মহাথের মহোদয়ের ইতিপূর্বে অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, যা সকলের দরবারে পাণ্ডিত্যের অধিকারে বিভুষিত হয়েছেন। আরও ১৫টি পান্ডুলিপি রয়েছে যা প্রকাশকের অভাবে ছাপানো সম্ভব হচ্ছে না।

ধর্মরস সকল রসের শ্রেষ্ঠ রস, ধর্মদান শ্রেষ্ঠদান এই পূণ্য মানসিকতায় শ্রদ্ধাবান-শ্রদ্ধাবতী ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকা নিজেদের পিতা-মাতা বা প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত করে মহাপূণ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

ভূমিকা

প্রতিটি প্রাণীর নিজস্ব ভাবনা রয়েছে। ভাবাবেগ রয়েছে। আর সে চায় তা ব্যক্ত করতে। ভাবনা বা অনুভূতি ব্যক্তকরণের নানা মুদ্রা বা হাবভাবকে 'বিজ্ঞপ্তি' বলা হয়। ত্রিপিটক সাহিত্যে একে 'বিজ্ঞপ্তি' (**বিঞ্ঞত্তি**) বলা হয়। যে কাজের মাধ্যমে এক প্রাণী তাঁর অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা আত্ম বা পর হিতে অন্য প্রাণীকে সূচিত বা বিজ্ঞপ্ত করে বা বিজ্ঞাপিত করায়, তা 'বিজ্ঞপ্তি'। 'বিজ্ঞপ্তি' দু-প্রকারের কায়-বিজ্ঞপ্তি (**কায়বিঞ্ঞত্তি**) ও বাণী-বিজ্ঞপ্তি (**বচীবিঞ্ঞত্তি**)।

কায়বিঞ্ঞত্তিঃ যা কুসল-চিত্তস্স বা অকুসল-চিত্তস্স বা অব্যাকত-চিত্তস্স বা অভিক্কমন্তস্স বা পটিক্কমন্তস্স বা আলোকেন্তস্স বা বিলোকন্তস্স বা সমিঞ্জেন্তস্স বা পসারেন্তস্স বা কায়স্স থম্ভনা, সন্থম্ভনা সন্থম্ভিতত্তং বিঞ্ঞত্তি বিঞ্ঞাপনা বিঞ্ঞাপিতত্তং - ইদং বুচ্চতি কায়বিঞ্ঞত্তি।

বচীবিঞ্ঞত্তিঃ যা কুসল-চিত্তস্স বা অকুসল-চিত্তস্স বা অব্যাকত-চিত্তস্স বা বাচা গির ব্যপ্পথে উদীরণং ঘোসো ঘোসকম্মং বাচা বচীভেদো, অয়ং বুচ্চতি বাচা। যা তায বাচায বিঞ্ঞত্তি বিঞ্ঞাপনা বিঞ্ঞাপিতত্তং - ইদং তং রূপ বচী-বিঞ্ঞত্তি।

(ধম্মসঙ্গণীপালি/অভিধম্মপিটক)

ভাষা অনেক প্রকারের। তবে মোটামুটি দু-প্রকারের। শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংকোচন-প্রসারণ-জনিত (সাংকেতিক) ভাষা। একে মুদ্রাও বলা হয়। অন্যটি হল প্রাণীর স্বরযন্ত্রের (অর্থাৎ গলা ও মুখ-মার্গের) প্রয়োগে উচ্চারিত শব্দময় ভাষা। এর মাধ্যমে প্রাণীর হাবভাব ব্যক্ত বা ভাষিত হয়, একারণে এক ভাষা (ভাসা) ও বলা হয়। সাধারণত 'ভাষা' বলতে প্রাণীর শেষোক্ত ঘোষ-কর্মকে বোঝায়। মানুষের স্বরযন্ত্র অন্য প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। তদুপরি তার মনও মানবেতর প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। এ কারণে তার ভাষা অন্য প্রাণীর ভাষা অপেক্ষা অনেক উন্নত স্তরের। মানুষের ভাষাও আবার নানা কারণে, বিশেষত তার আহার-বিহার, পেশা, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র ভেদে এবং জলবায়ু ও ভৌগোলিক কারণে নানা প্রকারের হয়। ভাষা ও প্রাণীর মধ্যে এক নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে। মানবের বিকাশের সাথে ভাষার ক্রমিক বিকাশ হয়। আবার কখন এ ভাষা মানবের আদর্শ ও উদ্দেশ্য পূর্তিতে সহায়ক এবং পূরকের ভূমিকাও পালন করে।

মানব-সভ্যতার বিকাশের ইতিহাসে আজ অবধি যে কয়জন মহাপুরুষের জীবনী স্বর্ণাক্ষরে এক এক বিশাল অধ্যায়রূপে যুক্ত হয়েছে তাদের মধ্যে ভগবান বুদ্ধের জীবনী বিশ্বমানব-সমাজে অত্যধিক সুফল ও প্রেরণাদায়ক বলে স্বীকৃতি পায়। তাঁর এ সার্থক ও সফল জীবন-চরিয়ায় ভাষার ভূমিকা কতখানি ছিল তা নিশ্চয় বিজ্ঞজনমাত্রেরই জানার বিষয়। অর্থাৎ বুদ্ধের ভাষা কি ছিল বা কেন তিনি এক বিশেষ ভাষাকে তাঁর ধর্ম-প্রচারের মাধ্যম হিসেবে চয়ন করেছিলেন তার রহস্যোদ্ঘাটন করাই এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বেশ কিছু সময় ধরে এ ব্যাপারে বিশ্বসনীয় মূল সাহিত্যিক সামগ্রীর সন্ধানে ছিলাম। একদিন নিজ আবাসে বসে 'বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখ দর্শন' শীর্ষক গ্রন্থের ভাষা পরিমার্জনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ ভাই সরিৎ এসে বলে - 'ভন্তে, পালি ভাষার সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। এটার ভিত্তিতে একটা নতুন বই লিখুন না।' তার সংগ্রহীত তথ্য পড়লাম। পালি অট্ঠকথা-সাহিত্য হতে সংগ্রহ করা মূল পাঠ অধ্যয়ন-কালে মনে হয়েছিল আকাশের চাঁদ যেন ক্ষণকালের তরে হাতে পেলাম। বহুদিন থেকে এমন তথ্যের সন্ধানে ছিলাম। সামনে অর্থাৎ ১৭ ই থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ তারিখে বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগের মাধ্যমে আয়োজিতব্য "পালি ভাষা ও সাহিত্য: পরিদৃশ্য ও সম্ভাবনা" বিষয়ক ত্রি-দিবসীয় আন্তর্জাতিক সেমিনারের কথা ভেবে তৎক্ষণাৎ লিখতে বসি, আর পরিণামে এ গ্রন্থের সৃজন হয়েছে।

সেমিনারে দেশ-বিদেশের অনেক গণ্যমান্য বিদ্বান উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের প্রাক্তন বিভাগাধ্যক্ষ ও একাধিক বৌদ্ধ গ্রন্থ ও গবেষণামূলক নিবন্ধের লেখক স্বনাম-ধন্য অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া মহোদয়ও এসেছিলেন। তাঁর হাতে এর পাণ্ডুলিপি দিয়ে এর মূল্যায়ণ করার অনুরোধ জানাই। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি প্রবাসকালীন স্বল্প সময়ে তাঁর মন্তব্য "অভিমত" আকারে লিখে দেন। এতে আমি বিশেষভাবে অনুগৃহীত হয়েছি।

পুস্তকটিকে বিদ্বদ্সমাজে পরিবেশনযোগ্য করার কাজে আয়ুষ্মান কচ্চায়ন, শ্রী সরিৎ বড়ুয়া, ডঃ সত্যেন্দ্র কুমার পাণ্ডের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এ গ্রন্থের প্রকাশনায় আর্থিক সহায়তা দিয়ে শ্রীমৎ বি. আর্য্যপাল ভিক্ষু, শ্রীমৎ শ্রদ্ধালংকার ভিক্ষু, অজিৎ বড়ুয়া, রূপালী বড়ুয়া ও সুপালী বড়ুয়া আমার আশীর্বাদ-ভাজন হয়েছে। আশীর্বাদ করি তাদের সবাকার সব সদ্বাসনা অচিরেই পূর্ণ হউক। আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল, প্রজ্ঞা আদি অত্যাবশ্যক সম্পত্তিতে যুক্ত হয়ে তারা সবাই সর্বশ্রীসম্পন্ন হউক।

তিথি : ফাল্গুনী পূর্ণিমা
তারিখ : ২৪/০২/২০০৫
স্থান : দিল্লী

ভিক্ষু সত্যপাল
গ্রন্থকার

অভিমত

'বুদ্ধের ভাষা' গ্রন্থের লেখক, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বুড়িঢষ্ট স্টাডিজ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ ভিক্ষু সত্যপাল একজন অনুসন্ধিৎসু গবেষক। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে এ ধারাই রক্ষিত হয়েছে। অনুরূপভাবে এ গ্রন্থটিকে তাঁর গবেষণার নতুন তত্ত্ব ও তথ্যসম্বলিত ফসল বলা যায়। আমি পাণ্ডুলিপিটি আদ্যান্ত পাঠ করেছি।

গ্রন্থকার 'বুদ্ধের ভাষা' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম, তাঁর বুদ্ধত্ব লাভ, বুদ্ধের পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ধর্মপ্রচার ও মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়ে ভাষার উৎকর্ষ সাধনের তত্ত্ব ও তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। আমার মনে হয়েছে, সিদ্ধার্থ গৌতম জন্মের পর যে উদান গেয়েছিলেন তা যেন প্রকৃতিরই স্বতঃস্ফূর্তভাষা এবং সে ভাষাতে কোন আঞ্চলিক প্রভাব ছিল না। পিতৃ-মাতৃকুলের প্রভাব থাকলেও তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল। তবে এ কথা সত্য যে, কপিলাবস্তু নগরে সিদ্ধার্থ গৌতমের শিক্ষা-দীক্ষা বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ শেষে গয়ার বোধিবৃক্ষ মূলে ছয় বছরের কঠোর তপস্যা এবং পরবর্তীতে মগধ ও কোশল রাজ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান তাঁর নিজস্ব ভাষাকে আরও পরিশীলিত করেছে- এতে কোন সন্দেহ নেই।

আসলে বুদ্ধের মূল ভাষা কি ছিল, মাগধী কিংবা পালি এর পূর্ণ অবয়ব কিনা তা বলা কঠিন। লেখক সেক্ষেত্রে পালি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে 'মাগধী ভাষা' বলে উল্লেখ করেছেন। শাক্যরাজ্য তথা কপিলাবস্তু নগরীর জনসাধারণের ভাষা কি ছিল তা বোধগম্য নয়। প্রাচীন ভারতের ষোড়শ মহাজনপদের অন্তর্গত কোশল রাজ্যের প্রান্তে শাক্যরাজ্য অবস্থিত। এটি এক সময় কোশল রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। সে দিক্ দিয়ে কোশলে প্রচলিত ভাষার প্রভাব শাক্যদের উপর পড়বে কিছুটা হলেও।

তথাগত বুদ্ধ বারাণসীর ইসিপতনে তাঁর নবধর্ম প্রচারের সাথে সাথে ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি গড়ে উঠে। রাজগৃহের বেণুবন এবং শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারকে কেন্দ্র করে ভারতে বহু বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হাজার হাজার ভিক্ষু ধর্ম-বিনয় শিক্ষা করতে থাকেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা বিভিন্ন ভাষাভাষী এ ভিক্ষুরা নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য একটি ভাষার প্রচলন করেন। সেটি সংস্কৃতও নয়, আবার প্রাকৃতও নয়। পরিশীলিত এ ভাষাটিকেই পরবর্তীকালে মাগধী ভাষারূপে আখ্যা দেওয়া হয়। এ মাগধীভাষা বুদ্ধের মূল ভাষার সাথে সমন্বিত হয়েছে। এ ভাষা স্বাভাবিক ভাষা থেকে উৎসারিত। পালি গ্রন্থে উল্লিখিত মূল ভাষা, আর্যভাষা, পালি ভাষা, ধর্ম-নিরুক্তি, স্বভাব নিরুক্তি প্রভৃতি একই ভাষা অর্থাৎ মাগধী ভাষারই বহির্প্রকাশ। ধর্মচক্র-প্রবর্তনকালে

বুদ্ধের ভাষা (সকায় নিরুত্তিয়া - নিজ ভাষা) সর্বস্তরের অর্থাৎ দেব-মানবের বোধগম্য ছিল। বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষুসংঘকে এ ভাষাতেই ধর্মপ্রচারের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। একষট্টিজন ভিক্ষু যাঁরা সর্বপ্রথম বুদ্ধের নিকট দীক্ষা নেন তাঁরাও দেব-মানবের হিতকল্পে এ ভাষাতেই সদ্ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

মাগধী ও পালি ভাষা একই পর্যায়ভুক্ত হলেও পালি শব্দটির বহুল প্রচলন বুদ্ধ-পরবর্তীকালের। অর্থকথাকার আচার্য বুদ্ধঘোষের পূর্বে পালি শব্দটির প্রয়োগ তেমন দেখা যায় না। তখন মাগধী ভাষারূপেই পরিগণিত ছিল। পালি ত্রিপিটকের পূর্ণ অবয়বের বিকাশ ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় থেকে ১ম শতকে। তখন থেকে বিশাল পালি সাহিত্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। পালি ভাষার উৎপত্তি ও ভৌগোলিক সংস্থান নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। পালি ভাষার উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে কেউ বলেন মগধ, কেউ কোশল, কেউ বা উড়িষ্যা। তাঁরা শব্দগত পার্থক্য ও সাদৃশ্য যোজনা করে এ সমস্ত মন্তব্য করেছেন। এ ক্ষেত্রে কোন ভাষাতে বিভিন্ন আঞ্চলিক শব্দের প্রবেশ বা প্রয়োগ অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে বিশাল জম্বুদ্বীপের (ভারতবর্ষের) ষোড়শ জনপদের জনগোষ্ঠীর ভাষার আঞ্চলিক শব্দগত প্রভাব পড়বেই। সে যাই হোক্ না কেন, পরিশেষে মগধই পালি ভাষার উৎপত্তির স্থল হিসেবে ধরে নিতে হয়।

সুতরাং বুদ্ধের মুখনিঃসৃত ভাষা আর তৎকালে বহুল প্রচলিত সর্বজনগ্রাহ্য ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার উৎপত্তি হয় সেটিই মাগধী ভাষা। বুদ্ধ এ ভাষাকেই 'সকায় নিরুত্তি' অর্থাৎ নিজ ভাষা বোঝাতে চেয়েছেন। পরবর্তীকালে এ মাগধী ভাষাই পালি ভাষার রূপ ধারণ করে ত্রিপিটকাকারে বুদ্ধবচন লিপিবদ্ধ হয়।

ডঃ ভিক্ষু সত্যপাল পালি ভাষা চর্চায় ও গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। 'বুদ্ধের ভাষা' গ্রন্থটি তারই উজ্জ্বল প্রতিফলন। গ্রন্থকার গ্রন্থটিতে নতুন তত্ত্ব ও তথ্য সন্নিবেশিত করে গবেষক, ছাত্র ও পাঠক-সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করেছেন। তজ্জন্য তাঁকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাই ও গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

সুমঙ্গল বড়ুয়া

প্রফেসর ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান

সংস্কৃত ও পালি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা - ১০০০,বাংলাদেশ

তাং- ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

স্থান - দিল্লী

বুদ্ধের ভাষা

'বুদ্ধের ভাষা' সম্পর্কে জানতে হলে তাঁর পারিবারিক পৃষ্ঠভূমিরও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বুদ্ধের পিতা ছিলেন শাক্যরাজ শুদ্ধোদন। মা ছিলেন শাক্যগণরাজ্যের পার্শ্ববর্তী কোলীয় রাজধীতা মহামায়াদেবী। মায়ের মৃত্যুতে মাসী মহাপ্রজাপতি গৌতমীর কোলে পিঠেই তিনি লালিত-পালিত হন।

সাধারণত শিশুর জীবনে হয় মাতৃকুলের, আর না হয় পিতৃকুলের পূর্ণ প্রভাব পড়ে, আর না হয় উভয় কুলের আংশিক প্রভাব পড়ে। আশৈশবকাল মহাপ্রজাপতি গৌতমীর স্নেহ-সান্নিধ্যে লালিত-পালিত হওয়ায় বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থের জীবনে মাতৃকুলের, বিশেষত মাতৃকুলের (অর্থাৎ কোলীয়) ভাষার প্রভাব পড়ার কথা।

তবে পরম্পরা বা বৌদ্ধ শাস্ত্র এ ব্যাপারে কি বলে তাই এখানে বিশ্লেষিত হবে।

সন্তানেরা মাতা-পিতার অনুকরণে পটু হয়। আশৈশবকাল লালিত-পালিত হওয়ায়, আর অধিকাংশ সময় মায়ের সান্নিধ্যে থাকায় সন্তানের জীবনে মায়ের আদব-কায়দা আর হাব-ভাবের ছাপ পিতার তুলনায় বেশী পড়ে। মায়ের বর্তমানে বা অবর্তমানে সন্তানেরা অনায়াসে ভাবতে থাকে - 'মা এটা করেছেন, ওটা করেছেন; এটা বলেছেন, ওটা বলেছেন; এভাবে বুঝিয়েছেন, ওভাবে বুঝিয়েছেন; ইত্যাদি। সন্তানেরা এসব কথা একের পর এক তাদের স্মৃতির মণি-কোঠায় থরে থরে সাজিয়ে রাখে। সময়ে অসময়ে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঐসব কথা সন্তানের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হয়। ঐ ব্যক্ত বাণী-সমূহ সন্তানের (নিজ) মাতৃভাষা হয়ে পড়ে।

'সন্তানের মাতৃভাষা কি হবে বা কি হয়?' -এ নিয়ে পালি সাহিত্যের অর্থকথায় এক রোচক্ তথ্যের চর্চা রয়েছে। প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত হল -

"ভাসং নাম সত্তা উগ্গণ্হতী'তি বত্বা পনেত্থ ইদং কথিতং। মাতাপিতরো হি দহরকালে কুমারকে মঞ্চে বা পীঠে বা নিপজ্জাপেত্বা তং তং কথয়মানা তানি তানি কিচ্চানি করোন্তি। দারকা তেসং তং তং ভাসং ববত্থাপেন্তি 'ইমিনা ইদং বুত্তং', ইমিনা ইদং বুত্ত'ন্তি। গচ্ছন্তে গচ্ছন্তে কালে সব্বম্পি ভাসং জানন্তি।"

(পটিসম্ভিদাবিভঙ্গো/ বিভঙ্গ-অট্ঠকথা)

মাতাপিতা উভয়ে একই এলাকার আর একই ভাষাভাষী হলে তাদের ভাষা গ্রহণে, আর ঐ ভাষায় কথা বলতে সন্তানকে কোন বেগ্ পেতে হয় না। কিন্তু মাতা-পিতা যদি ভিন্ন ভাষাভাষী হয়ে থাকেন তবে সন্তানকে ওদের দুই ভাষা হতে একটিকে মুখ্যরূপে চয়ন করতে হয়। এখানে 'চয়ন করতে হয়' কথার চেয়ে 'সন্তানের সরল ও শুদ্ধ মনে একটির ছাপ অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী পড়ে' বললে বোধ হয় অধিক তর্কসংগত হয়।

পালি সাহিত্যে আরও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে- মা যদি তামিলভাষিনী, আর পিতা যদি অন্ধ্রকভাষী হন, আর সন্তান যদি তামিলভাষিনী মায়ের কথা সবার আগে শোনে, তবে ঐ তামিলভাষাই হবে ঐ সন্তানের মাতৃভাষা। আর যদি মায়ের কথা শোনার পূর্বে সন্তান তার অন্ধ্রকভাষী পিতার কথা শোনে তবে অন্ধ্রকভাষাই হবে সন্তানের মাতৃভাষা।

"মাতা দমিলী, পিতা অন্ধকো। তেসং জাতো দারকো সচে মাতুকথং পঠমং সুণাতি, দমিল-ভাসং ভাসিস্সতি। সচে পিতুকথং পঠমং সুণাতি, অন্ধক-ভাসং ভাসিস্সতি।"

(পটিসম্ভিদাবিভঙ্গো/বিভঙ্গ-অট্ঠকথা)

'সন্তানেরা মায়ের আদর্শে আদর্শবান বা আদর্শবতী হয়ে উঠুক'- এ সুপ্ত ভাবনা সব মায়েদের হৃদয়ে ক্রিয়াশীল থাকে।

মাতার অভাবে পিতার, আর পিতার অভাবে মাতার ভাষা সন্তানের ভাষা হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু উভয়ের অভাবে অনাথ সন্তানের ভাষা কি হয়? নিশ্চয়ই যে এলাকায়, যাদের আশ্রয়ে এবং যাদের কোলে পিঠে ঐ অনাথ সন্তান মানুষ হয়, তাদেরই কারও ভাষা সন্তানের মূল ভাষা হয়ে পড়ে।

কিন্তু এমন পরিস্থিতির কথাও কি কেহ ভাবতে পারেন যেখানে মাতাপিতা উভয়ই জীবিত থাকতেও তাদের কারও কথা শোনার পূর্বেই সন্তান নিজে কথা বলা আরম্ভ করে? এমন পরিস্থিতিতে ঐ সন্তানের ভাষা কি হতে পারে?

পালি সাহিত্যে এমন পরিস্থিতি, আর এমন সন্তানের ভাষারও চর্চা হয়েছে। পালি সাহিত্য অনুসারে শাক্যকুলরাজ শুদ্ধোদনের প্রথম পুত্র বোধিসত্ত্বের (ভাবী সিদ্ধার্থ) জন্ম পিতৃকুলেও হয় নি, আবার মাতৃকুলেও হয় নি। তাঁর জন্ম হয়েছিল পিতৃকুলের বাসস্থান কপিলাবস্তু ও মাতুকুলের বাসস্থান দেবদহ - এ দুয়ের ঠিক্ মধ্যবর্তী লুম্বিনী নামক বনে।

মানব সমাজে অনাদিকাল হতে অনেক মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে। মহাপুরুষদের জন্মকে কেন্দ্র করে তাঁকে মহিমামণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে নানা অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত হয় বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্রে। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত তিল্‌কে তাল করারও প্রয়াস হয়েছে ওসবের বর্ণনায়।

বৌদ্ধ ধর্মীয় শাস্ত্রসমূহে শাক্য-কুলরাজ শুদ্ধোদন ও মহামায়াদেবীর পুত্ররূপে জাত বোধিসত্ত্বের জন্মলগ্নে ও জন্মের ঠিক পর ঘটিত নানা অসামান্য ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। এমন সব ঘটনার মধ্যে তাঁর পদচারণা আর সিংহগর্জনার ঘটনা বহুচর্চিত। জন্মের পর উত্তরাভিমুখী হয়ে সাত পা চলার পর দাড়িয়ে ডান হাতের তর্জনী উঁচু করে তিনি অনায়াসে বলেছিলেন-

"অগ্গো হমস্মি,
জেট্‌ঠো হমস্মি,
সেট্‌ঠো হমস্মি,
অয়মন্তিমা জাতি।
নত্থি'দানি পুনব্‌ভবো।।"

(নিদানকথা/জাতক-অট্‌ঠকথা)

বঙ্গানুবাদ -

'আমি অগ্র,
আমি জ্যেষ্ঠ,
আমি শ্রেষ্ঠ,
এ অন্তিম জন্ম।
এর পর আর পুনর্ভব হবে না।'

এ গ্রন্থে উপরোক্ত মূল উদ্ধৃতি সম্পর্কে ভাষা-বিজ্ঞান-সম্মত ও দার্শনিক-তত্ত্ব-মূলক বিশ্লেষণ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে।

''জাতমত্তস্‌সেব বোধিসত্তস্‌স ঠানাদীনি যেসং বিসেসাদিগমানং পুব্বনিমিত্তভূতানীতি তে নিদ্ধারেত্বা দস্‌সেন্তো- "এত্থ আদিমাহ। তত্থ পতিট্‌ঠানং চতুরিদ্ধিপাদ-পটিলাভস্‌স পুব্বনিমিত্তং ইদ্ধিপাদবসেন লোকুত্তর-ধম্মেসু সুপ্পটিট্‌ঠিত-ভাবসমিজ্জনতো। উত্তরাভিমুখভাবো লোকস্‌স উত্তরণবসেন গমনবসেন গমনস্‌স পুব্বনিমিত্তং।"

(বোধিসত্তধম্মতা বণ্ণনা/ মহাবগ্গটীকা/দীঘনিকায়)

এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে কপিলাবস্তু হতে দেবদহে যাবার সব ব্যবস্থা করিয়েছিলেন রাজা শুদ্ধোদন। তিনি নিজে কিন্তু ঐ যাত্রায় সহযাত্রীরূপে

ছিলেন না। কাজেই রাজকুমারের জন্ম-লগ্নে এবং নবজাতকের সাথে মহামায়া দেবীর কপিলাবস্তু ফিরে আসার প্রাক্কাল অবধি নবজাতক তাঁর পিতার শব্দ শোনেন নি। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ নিয়ে কারও কোন প্রকারের দ্বিমত নেই। অন্য দিকে নবজাতকের মা তাঁর সন্তানের প্রতি অপত্য স্নেহ-জনিত কিছু কথা বলার পূর্বেই নবজাতক চারদিক্ সিংহাবলোকনকালে উত্তরাভিমুখী হয়ে সাত পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ান। আর ডান হাতের তর্জনী উঁচু করে তিনি এক - 'উদান'বাক্য উদ্গার করেন। অর্থাৎ মা-বাবা উভয়ে বেঁচে থাকতে তাঁদের কথা শোনার পূর্বেই তিনি নিজে কথা বলা আরম্ভ করেছিলেন। এ পরিস্থিতিতে নবজাতকের ভাষা কি ছিল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসু-জন-মাত্রেরই মনকে আলোড়িত করে।

এর পরম্পরাগত উত্তর পালি সাহিত্যে রয়েছে। উপরোক্ত সূত্র হতে তা এখানে উদ্ধৃত হল।

"উভিন্নম্পি পন কথং অসুণন্তো মাগধভাসং ভাসিস্সতি। যোপি অগামকে মহারঞ্ঞে নিব্বত্তো তত্থ অঞ্ঞো কথেন্তো নাম নত্থি সোপি অত্তনো ধম্মতায় বচনং সমুট্ঠাপেন্তো মাগধভাসমেব ভাসিস্সতি।"

(বোধিসত্তধম্মতা বণ্ণনা/ মহাবগ্গটীকা/দীঘনিকায়;
পটিসম্ভিদাবিভঙ্গো/ বিভঙ্গ-অট্ঠকথা)

অর্থাৎ জন্মের তৎকাল পর মাতাপিতা উভয়ের শব্দ না শুনে থাকার পরিস্থিতিতে নব-জাতক 'মাগধী ভাষা'য় কথা বলবে। আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যদি কোন সন্তান গ্রামাঞ্চলের বাইরে বনে, জঙ্গলে বা মহারণ্যে জন্ম গ্রহণ করে, আর যদি সেখানে তার সাথে কথা বলার কেহ না থাকে তবে ঐ নবজাতক নিজ ধর্মতাগুণে মাগধী-ভাষায় কথা বলা শিখবে।

এখানে প্রশ্ন জাগে এক নবজাতক 'মাগধী ভাষা'তেই কথা বলা শিখবে কেন? আর অন্য ভাষায় এক নবজাতক কথা বলা শিখবে না কেন? এ প্রশ্নের সমাধান জানার পূর্বে উপরোক্ত 'উদ্ধৃতি'-দানের পৃষ্ঠভূমি জানা থাকা আবশ্যক।

'মাগধী ভাষা' (নিরুক্তি) কি? আর এ ভাষার ভৌগোলিক ক্ষেত্রফলের বিস্তার কতখানি ছিল? এ সব প্রশ্নেরও উত্তর জানা থাকা প্রয়োজন রয়েছে এ প্রসঙ্গে।

জম্বুদ্বীপের মধ্যম-মণ্ডলের বিশেষত বুদ্ধকালীন বৃহত্তর ভারতবর্ষে অনেক রকমের ভাষার প্রচলন ছিল। ওসবকে মোটামুটিভাবে দু শ্রেণীতে ভাগ করা যায় - (১) সংস্কৃত ও (২) প্রাকৃত।

সংস্কৃত : যে ভাষার সংস্কার ভাষা-বিকাশের নানা পর্যায়ে ব্যাকরণ-শাস্ত্রের নানা নিয়মাবলী, অলংকার ও ছন্দ-শাস্ত্রের নিয়ম-নীতির প্রয়োগে হয়েছে তা হল 'সংস্কৃত'। 'সংস্কৃত' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ (সম্+কৃত) হতে স্পষ্ট হয়। 'সম্' উপসর্গ এখানে বিশেষ' অর্থ সূচক। বিশেষ বিধিতে যা 'কৃত' (অলংকৃত) হয়েছে তা 'সংস্কৃত'। এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে 'সংস্কৃত'-ভাষা ও সাহিত্য নানা স্তরে বিকশিত হয়েছে। মোটামুটিভাবে দুটি (১) প্রাগ্বুদ্ধ বা বুদ্ধকালীন সংস্কৃত ভাষা এবং (২) বুদ্ধোত্তর বা পাণিনি- কালীন সংস্কৃত ভাষা। ত্রিপিটকে বুদ্ধকালীন ত্রি-বেদের (**তিন্নং বেদান'ন্তি ইরুবেদয়জুবেদ সামবেদানং**) চর্চা রয়েছে। বেদের সংস্কৃত ভাষাকে 'বৈদিক সংস্কৃত'-ভাষা বলা যেতে পারে। 'বৈদিক সংস্কৃত' ছাড়াও সংস্কৃতের আর একটি রূপ ছিল। সেটি হল লৌকিক সংস্কৃত। 'বৈদিক সংস্কৃতে'র কাব্যিক রূপকে ছান্দস্ বলা হত। জনসমাজে 'ছান্দস ভাষা' অপ্রচলিত-প্রায় হয়ে পড়েছিল। ভাষাটি নানা পর্যায়ে সংস্কৃত হওয়ায় এতে রচিত সংস্কৃত-সাহিত্যও নিশ্চয়ই অতি মার্জিত। এ সাহিত্য বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্য হবার গৌরব অর্জন করে। নানা বাঁধনে শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ায় এ ভাষা শেখা এক শ্রমসাধ্য ব্যাপার। তদুপরি তা সময়-সাপেক্ষও বটে। পরিণামে তদ্‌কালীন বৃহত্তর ভারতবর্ষের এক অত্যল্প শিক্ষিত সমাজ ও অল্প-সংখ্যক সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি বা ব্যক্তি-গণ তাদের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, সাহিত্যিক কৃতিতে, দার্শনিক বিচার-বিনিময়কালে এ ভাষার প্রয়োগ করে থাকতেন। সমাজের বৃহদংশ তাদের দৈনন্দিন দিনচরিয়ায় এ ভাষার প্রয়োগ করতেন না।

প্রাকৃত: সমাজের এ বৃহদংশ নানা অঞ্চল ও নানা জনপদ ভেদে বিভক্ত ছিল। তারা নিজ নিজ আঞ্চলিক (প্রান্তীয় বা প্রাদেশিক) ভাষায় কথা বলতেন। সূত্রপিটকের অন্তর্গত অঙ্গুত্তরনিকায়াগত সূত্রানুসারে তদ্‌কালীন বৃহত্তর ভারত ষোলটি শক্তিশালী জনপদে বিভক্ত ছিল। ঐ জনপদগুলো হল-

(১) অঙ্গ, (২) মগধ, (৩) কাশী, (৪) কোশল, (৫) বজ্জি, (৬) মল্ল, (৭) চেদী, (৮) বৎস, (৯) কুরু, (১০) পাঞ্চাল, (১১) মৎস্য, (১২) সুরসেন, (১৩) অস্‌সক, (১৪) অবন্তী, (১৫) গান্ধার এবং (১৬) কম্বোজ।

"যো ইমেসং সোলসন্নং মহাজনপদানং পহূতসত্তরতনানং ইস্‌সরাধিপচ্চং রজ্জং কারেয্য, সেয়্যথীদং- অঙ্গানং, মগধানং, কাসীনং, কোসলানং, বজ্জীনং, মল্লানং, চেতীনং, বংসানং, কুরূনং, পঞ্চালানং, মচ্ছানং, সুরসেনানং, অস্‌সকানং, অবন্তীনং, গন্ধারানং, কম্বোজানং।"

(অঙ্গুত্তরনিকায়)

উপরোক্ত তালিকায় শাক্যগণরাজ্য ও কোলীয়রাজ্যের নামোল্লেখ নেই। এ হতে ধরে নেয়া যেতে পারে তালিকাভুক্ত ষোলটি শক্তিশালী জনপদ ছাড়াও আরো অনেক ছোটো খাটো রাজ্য ছিল। প্রতিবেশী মহাশক্তিশালী জনপদের রাজনীতি ও কূটনীতির দাপটে এবং আক্রমণে ছোট জনপদগুলো কখন এর আর কখনও অন্য মহাশক্তিশালী জনপদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়তো। হয়ত এ কারণে বুদ্ধ নিজেকে কোসল জনপদবাসী রূপে পরিচয় দিতেন।

মহাভিনিষ্ক্রমণের পর তাপস সিদ্ধার্থ যখন ভিখারীর বেশে রাজগৃহের অলিতে গলিতে ভিক্ষে সংগ্রহ করে চলেছিলেন, তখন মগধ রাজ বিম্বিসার তাঁকে রাজপ্রাসাদে সাদরে ডাকিয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। দেশ ও বংশ পরিচয় দিয়ে তাপস সিদ্ধার্থ জানান৩

"উজুং জনপদো রাজ, হিমবন্তস্স পস্সতো,
ধনবীরিয়েন সম্পন্নো, কোসলেসু নিকেতিনো।
আদ্দিচ্চা নাম গোত্তেন, সাকিয়া নাম জাতিয়া,
তম্হা কুলা পব্বজিতোম্হি, ন কামে অভিপত্থয়ং।"

(পব্বজ্জাসুত্ত/ সুত্তনিপাত)

প্রত্যেকটি জনপদেরই এক বা একাধিক আঞ্চলিক ভাষা (উপভাষা, মৌখিক ভাষা, বা নিরুক্তি) থাকাটা অতি স্বাভাবিক। স্বভাবতই আঞ্চলিক ভাষার সংখ্যাও নিশ্চয়ই ষোলর অধিক ছিল।

পালি সাহিত্যে তিষ্য-দত্ত নামে এমন এক বহু-ভাষাভাষী ভিক্ষুর উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি তদ্‌কালীন ভারতবর্ষের আঠারটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন।

"তিস্সদত্তত্থেরো কির বোধিমণ্ডে সুবণ্ণসলাকং গহেত্বা অট্ঠারসসু ভাসাসু কতরভাসায় কথেমী'তি পবারেসি। তং পন তেন অত্তনো উগ্গহে ঠত্বা, নো পটিসম্ভিদায় ঠিতেন। সো হি মহাপঞ্ঞতায় তং তং ভাসং কথাপেত্বা কথাপেত্বা উগ্গণ্হি; ততো উগ্গহে ঠত্বা এবং পবারেসি।"

(পটিসম্ভিদাবিভঙ্গো/বিভঙ্গ-অট্ঠকথা)

এতে স্বত প্রমাণিত হয় যে তদ্‌কালীন বৃহত্তর ভারতবর্ষে অন্তত আঠারটি ভাষা অবশ্যই প্রচলিত ছিল। এর বেশীও হয়ত ছিল। ওসব ভাষার মধ্যে মাগধী, ওট্ঠ, কিরাত, অন্ধক, যোনক, দমিল আদি ভাষা প্রমুখ ছিল।

'সংস্কৃত'-বর্জিত তদ্‌কালীন বৃহত্তর ভারতবর্ষের এমন সব আঞ্চলিক ভাষা-সমূহকে ভাষা-বৈজ্ঞানিকগণ 'প্রাকৃত' (পাকটিকা নিরুত্তি) সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন।

কারণ এ সব প্রান্তের (জনপদের) এক নবজাতক শিশু এবং সমাজের অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত এবং শিক্ষিত সমাজ এসব আঞ্চলিক ভাষাকে অনায়াসে ও অল্প সময়ে বলতে পারেন। শিশুরা যে মুক্ত ছন্দে বা ভাষায় মায়েদের সাথে কথা বলে বা বলতে শেখে তা কোন পুঁথিগত বিদ্যা নয়। শিশুরা তা অনায়াসে সহজ, সরল ও স্বাভাবিক (প্রাকৃতিক) ভাবে শেখে। গ্রামাঞ্চলের ভাষাগুলো, সে যে অঞ্চলেরই হউক না কেন, পুঁথিগত বিদ্যায় সৃষ্ট হয় না। আপনা আপনিই মুখে মুখে তা প্রচলিত হয়। আসলে এমন 'প্রাকৃত' ভাষাই হল মানবসমাজের 'আদিভাষা'। 'প্রাকৃত' শব্দের সন্ধি - বিচ্ছেদ প্রাক্ + কৃত) হতে তা পুষ্ট হয়। ('প্রাক্' ও 'কৃত') শব্দ দুটির সংযোগে সৃষ্ট 'প্রাকৃত' শব্দের অর্থ হল যা পূর্বে বা প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক রূপে কৃত। **'প্রকৃত্যা স্বভাবেন সিদ্ধং প্রাকৃতম্'** বা **'প্রকৃতীনবং সাধারণ - জনানমিদং প্রাকৃতম্'।**

তদ্‌কালীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ নিজেদের ও নিজেদের ভাষাকে অপর সব ভাষা হতে পৃথকীকরণের এবং অতি বিশেষরূপে মর্য্যাদিত করার উদ্দেশ্যে 'সংস্কৃত'-ভাষাকে 'দেবভাষা' বা দেবতুষ্টি-করণের ভাষা-রূপে প্রচারিত করেন। তারা সংস্কৃতকে জনভাষারূপে কখনও প্রচার করেন নি। এতে জনমানসে এক বদ্ধধারণা জন্মায় যে এ ভাষার সাথে জন-সাধারণের কোন আত্মিক সম্বন্ধ নেই। বস্তুত 'সংস্কৃত' ভাষা ও সাহিত্যে আঞ্চলিক জন-জীবনের সহজ ও সরল ভাবাভিব্যক্তি উল্লেখনীয় ভাবে প্রতিফলিত হয় না। এতে তার ছোঁয়াও পাওয়া যায় না বললে বোধ হয় মিথ্যে হবে না।

এমন সব সহজ ও সরল 'প্রাকৃত' নামে পরিচিত আঞ্চলিক ভাষা-গুলোর সমূহের মধ্যে 'মাগধী ভাষা'টি আবার তুলনাত্মকভাবে অধিক উন্নতমানের হবার সাথে অধিক সরলও ছিল। 'মাগধীভাষা' মূলত মগধ জনপদের একটি মুখ্য জনভাষা ছিল। এ কারণেই এর এ নাম। মগধের জনভাষা হলেও, এর জনপ্রিয়তা কেবল মগধের সীমায় সীমিত ছিল না। মগধের সীমা ছাড়িয়ে প্রতিবেশী জনপদ-গুলোতেও এর জনপ্রিয়তা ছিল। জম্বুদ্বীপের জনপদগুলোতে প্রচলিত প্রমুখ জনভাষা-গুলোর মধ্যে 'মাগধী ভাষা' একটি অন্যতম ভাষা হবারও গৌরব অধিকার করেছিল। শুধু যে মানব-সমাজেই এ ভাষা জনপ্রিয় ছিল তা নয়, পশুলোকে, প্রেতলোকে, এমন কি দেব-ব্রহ্মলোকেও এর জনপ্রিয়তা ছিল। এর এ বহুল জনপ্রিয়তার কারণে এ 'মাগধী ভাষা' অন্য আঞ্চলিক ভাষাগুলোর তুলনায় অধিক দীর্ঘস্থায়ী হয়। 'মাগধী' ব্যতীত অন্য আঞ্চলিক ভাষাগুলোতে কালের ও দুরত্বের ব্যবধান-জনিত পরিবর্তনের সাথে এদের ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণগুলোরও আশু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এসব

কারণে অনেক সময় এরা এদের মূল স্বরূপ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু 'মাগধী-ভাষা' দেব-মানব-ব্রহ্মলোকে আর্যপুরুষগণ কর্তৃক দৈনন্দিন জীবন-চরিয়ায় প্রযুক্ত হওয়ায় এতে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায় না। পরিবর্তন আসলেও স্থান আর কাল ভেদে কদাচিৎ হয়। সর্বত্র, সর্বদা ও সর্বতোভাবে এতে পরিবর্তন হয় না। কল্পকাল-বিনাশের পরও এ ভাষা এ সমাজে প্রচলিত থাকে। এটি 'মাগধী ভাষা'র একটি অন্যতম বিশেষত্ব।

"নিরয়ে, তিরুছানযোনিয়ং, পেত্তিবিসয়ে, মনুস্সলোকে, দেবলোকে'তি সব্বত্থ মাগধভাসাব উস্সন্না, তত্থ সেসা ওট্ঠ-কিরাত-অন্ধক-যোনক-দমিল-ভাসাদিকা অট্ঠারস ভাসা পরিবত্তন্তি, কালন্তরেন অঞ্ঞাপি হোন্তি চ নস্সন্তি চ।

অয়মেবেকা যথাভুচ্চ-ব্রহ্মবোহার-অরিয়বোহার-সঙ্খাতা মাগধভাসা ন পরিবত্ততি। সা হি কত্থচি কদাচি পরিবত্তন্তীপি ন সব্বত্থ সব্বদা সব্বত্থাব পরিবত্ততি, কপ্প-বিনাসে পি তিট্ঠতিয়েব।"

(পটিসম্ভিদাবিভঙ্গো/বিভঙ্গ-অট্ঠকথা)

তথাগত সম্যক্ সম্বুদ্ধ ও তাঁর নবাবিস্কৃত সদ্ধর্মের প্রচার-প্রসার 'মাগধী-ভাষা'তেই করেছেন। কেন? কেন না এ ভাষা অন্য আঞ্চলিক ভাষা অপেক্ষা অধিক শ্রুতিমধুর। অনায়াসে ও সুখে (আরামে) এ ভাষা উচ্চারিত হয়। সুখে তা বোধগম্যও হয়। কর্ণসুখকর হবার সাথে সহজে তা হৃদয়কেও ছোঁয়। অন্য ভাষায় ভাষান্তরিত (অনুদিত) মূল বুদ্ধবাণী বহুবার অধ্যয়ন করলেও তার মর্মার্থ স্পষ্ট হয় না। তবে এ কথা আর্য পুরুষগণের বেলায় প্রযুক্ত নয়। তাঁরা যে দেশবাসী হোক্ না কেন, আর যে কোন ভাষায় রচিত বুদ্ধবাণীর মর্মার্থ সহজেই উদ্ধার করতে পারেন।

"সম্মা সম্বুদ্ধোপি তেপিটকং বুদ্ধবচনং তন্তিং আরোপেন্তো মাগধভাষায় এব আরোপেসি। কস্মা? এবঞ্হি অত্থং আহরিতুং সুখং হোতি। মাগধ-ভাসায় হি তন্তিং আরূল্হস্স বুদ্ধবচনস্স পটিসম্ভিদাপ্পত্তানং সোতপথাগমনমেব পপঞ্চো। সো তে পন সজ্ঝটিতমত্তেনেব নয়সতেন নয়সহস্সেন অত্থো উপট্ঠাতি।

অঞ্ঞায় পন ভাসায় তন্তিং আরূল্হং সোধেত্বা উগ্গহেতব্বং হোতি। বহুম্পি উগ্গহেত্বা পন পুথুজ্জনস্স পটিসম্ভিদাপ্পত্তি নাম নত্থি, অরিয়সাবকো নো-প্পটিসম্ভিদাপ্পত্তো নাম নত্থি।"

(বিভত্তিসুত্তবণ্ণনা-নিট্ঠিতং; পটিসম্ভিদাবিভঙ্গো/বিভঙ্গ-অট্ঠকথা)

শাস্তা বুদ্ধ তাঁর (বুদ্ধগণের) ধর্ম শুধু মাত্র মানবের হিতে বা সুখে প্রচার করেন নি। তা করেছিলেন বহুজনের হিতে বহুজনের সুখে, এর মূলে ছিল সর্ব স্তরের প্রাণীর, বিশেষত দেব-মানব-ব্রহ্মগণের হিতসাধনের কামনা। এ কারণে শাস্তা কর্তৃক ধর্মচক্র প্রবর্তিত হতেই ভূমিস্থিত দেবলোক হতে আরম্ভ করে ব্রহ্মলোক-বাসী সর্ব স্তরের দৃশ্যাদৃশ্য দেবগণ ক্রমান্বয়ে অভূত-পূর্ব আনন্দধ্বনি ব্যক্ত করেছিলেন।

"পবত্তিতে চ পন ভগবতা ধম্মচক্কে; ভূম্মা দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং- "এতং ভগবতা বারাণসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং, অপ্পটিবত্তিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মি'ন্তি।" ভুম্মানং দেবানং সদ্দং সুত্বা চাতুম্মহারাজিকা দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং . . . পে . . .। চাতুম্মহারাজিকানং দেবানং সদ্দং সুত্বা তাবতিংসা দেবা . .. . . পে .. .. .. । যামা দেবা .. .. .. পে .. .. .. । পরনিম্মিত-বসবত্তী দেবা .. .. .. পে .. .. .. । ব্রহ্মকায়িকা দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং .. .. .. এতং ভগবতা বারাণসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং অপ্পটিবত্তিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মি'ন্তি।"

(মহবগ্গ/বিনয়পিটক)

এ ঘটনা হতে একটি কথা স্বত স্পষ্ট হয় যে ধর্মচক্রপ্রবর্তন-কালে বুদ্ধের প্রযুক্ত ভাষা (**সকা নিরুত্তি**) সর্বস্তরের দেবগণের বোধগম্য ছিল।

নিজ ভাষায় (**সকায় নিরুত্তিয়া**) ধর্ম-প্রচার করেন। সংঘ স্থাপিত হয়। নানা প্রান্তের নানা পেশার নানা পরম্পরার নানা ভাষাভাষী মুমুক্ষু ব্যক্তি হয় ব্যক্তিগত-ভাবে, আর না হয় সামূহিকভাবে দীক্ষিত হন। এভাবে সংঘ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তাঁর অনাগারিক শিষ্যসমূহকেও আদিতে-কল্যাণকারী, মধ্যে-কল্যাণকারী ও অন্তে-কল্যাণকারী ধর্ম-প্রচারের আদেশ দেন।

"অথ খো ভগবা তে ভিক্খু আমন্তেসি'মুত্তাহং, ভিক্খবে, সব্ব-পাসেহি যে দিব্বা যে চ মানুসা। তুম্হে পি, ভিক্খবে, মুত্তা সব্বপাসেহি, যে দিব্বা যে চ মানুসা। চরথ, ভিক্খবে, চারিকং বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় অত্থায় হিতায় সুখায় দেব-মনুস্সানং। মা একেন দ্বে অগমিত্থ। দেসেথ, ভিক্খবে, ধম্মং আদি-কল্যাণং মজ্ঝে কল্যাণং পরিয়োসাণ-কল্যাণং সাত্থং সব্যঞ্জনং কেবলপরিপুণ্ণং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিয়ং পকাসেথ। . . . . "

(মহাবগ্গ/ বিনয়পিটক)

এরপর ভগবান ঐ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বলেন "হে ভিক্ষুগণ, দিব্য বা মানুষী সব বন্ধন হতে আমি মুক্ত, আর আপনারাও দিব্য বা মানুষী সব বন্ধন হতে মুক্ত। [এবার আর অযথা কালক্ষেপন করা উচিত হবে না।] হে ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতে বহুজনের সুখে বিশ্ববাসীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে দেব-মানবের স্বার্থে, হিতে ও সুখে [দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুন আর] বিচরণ করুন। একপথে দু জন যাবেন না।

হে ভিক্ষুগণ, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এমন ধর্মের প্রচার করুন যা আদিতে কল্যাণকারী, যা মধ্যেও কল্যাণকারী, আবার যা অন্তেও কল্যাণকারী। কেবল এমন ব্রহ্মচর্যের প্রকাশ করুন যা অর্থ-যুক্ত, যা ব্যঞ্জন-যুক্ত, আর যা পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ।

উপরোক্ত নির্দেশে কোন্ ভাষায় তাঁর ধর্ম প্রচার করা হবে তাঁর কোন স্পষ্ট সংকেত নেই। যে একষট্টি জন আর্য শ্রাবককে শাস্তা এ নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে বুদ্ধ কর্তৃক প্রযুক্ত ভাষা বোধগম্য ছিল। তাঁদের অধিকাংশই মগধ বা মগধের সীমান্তবর্তী জনপদের নিবাসী ছিলেন কাজেই বুদ্ধবাণী সংরক্ষণের সমস্যা তখনও উঠে নি।

রাজগৃহের বেলুবনারামে যথেচ্ছা বিহারের পর পিতা শুদ্ধোদনের আমন্ত্রণে জ্ঞাতিসম্মেলনের উদ্দেশ্যে শাস্তা কপিলাবস্তু যান। ন্যাগ্রোধারামে বিহার করেন। তারপর দিন ভিক্ষাপাত্র হাতে তিনি রাজপথে বেড়িয়ে পড়েন ভিক্ষান্ন সংগ্রহে। ক্রমশ তিনি রাজপ্রাসাদের মুখ্য দরজায় এসে দাঁড়ান। এ খবর শুনতেই শাক্যরাজ শুদ্ধোদন আর কালবিলম্ব না করে উপচে পড়া অপার অপত্য স্নেহাধিক্যে পুত্রদর্শনে রাজপ্রাসাদের বাইরে আসেন। জানতে চান রাজপুত্র হয়ে কেন তিনি ভিক্ষান্ন সংগ্রহে ব্রতী হয়েছেন। তাঁদের রাজপরম্পরায় কেহ কোনদিন ভিক্ষা করেন নি। আপনি কেন করছেন? কেন লজ্জা দিচ্ছেন এভাবে? আরও জানতে চান - এ বিশাল ভিক্ষু সংঘকে তাঁর খাওয়াতে অসমর্থ?

উত্তরে শাস্তা বুদ্ধ জানান- মহাসম্মতাদি আপনার (পিতার) রাজবংশ। আমার বংশ নয়। আমার বংশ বুদ্ধবংশ। বুদ্ধগণ ভিক্ষে করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

"কিং ভন্তে, অম্হে লজ্জাপেথ, কিমত্থং পিণ্ডায় চরথ, কিং এত্তকানং ভিক্খুনং ন সক্কা ভত্তং লদ্ধং তি সঞ্ঞং করিত্থা তি?

বংসচরিত্তমেতং মহারাজ, অম্হাকং তি ননু ভন্তে, অম্হাকং মহাসম্মতখত্তিয়বংসো বংসো? তত্থ চ একখত্তিয়ো পি ভিক্খাচারো নাম নত্থী তি।

অয়ং মহারাজ, রাজংবসো নাম তব বংসো। অম্হাকং পন দীপঙ্করো কোণ্ডঞ্ঞো ..... পে .... কস্সপো তি অয়ং বুদ্ধবংসো নাম। এতে চ অনেক সহস্স সংখা বুদ্ধা ভিক্খাচারা, ভিক্খাচারেনেব জীবিকং কপ্পেসুন্তি ....''

(নিদানকথা/ জাতকট্ঠকথা)

সংঘ স্থাপনার প্রারম্ভিক পর্যায়ে সংঘে দীক্ষিত নবাগন্তুকদের মধ্যে ব্রাহ্মণপরিবারে জাত সংস্কৃতজ্ঞদের সংখ্যা অধিক ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে অসংস্কৃতজ্ঞ নবদীক্ষিতদের সংখ্যাও হু হু করে বেড়ে যাচ্ছিল। তারা তাদের পরম্পরাগত নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায় (দেস-ভাসা) তথাগত বুদ্ধের বাণী প্রচারে রত হন। এতে সংস্কৃতজ্ঞ স্থবির-মহাস্থবিরগণ চিন্তাগ্রস্ত হন। তাদের দুশ্চিন্তার কারণ একটিই। আর সেটি ছিল নানা ভাষাভাষী ভিক্ষুগণের মাধ্যমে যদি এভাবে নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায় বুদ্ধবাণীর প্রচার-প্রসার নিরন্তর চলতে থাকে তবে অচিরেই বুদ্ধবাণীর একরূপতা থাকবে না। একরূপতা না থাকলেই বুদ্ধবাণী প্রদূষিত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। বুদ্ধবাণীকে কি করে প্রদূষণ-মুক্ত রেখে দীর্ঘস্থায়ী ও সুরক্ষিত রাখা যায়? ঐ সময় যমেলু ও তেকুল নামে দু ভাইও সংঘে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তান ছিলেন। **(তেন খো পন সময়েন যমেলুতেকুলা নাম ভিক্খু দ্বে ভাতিকা হোন্তি ব্রাহ্মণজাতিকা কল্যাণবাচা কল্যাণ-বাক্করণা।)** তদুপরি তারা ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ ভিক্ষু। তারাও অন্যান্য সংস্কৃতজ্ঞ ভিক্ষুগণের ন্যায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। শেষে সমস্যার সমাধান পেতে শাস্তার কাছে তারা একটি প্রস্তাব নিয়ে যান। প্রস্তাবটি ছিল এরূপ-

"এতরহি, ভন্তে, ভিক্খু নানা-নামা নানা-গোত্তা নানা-জচ্চা নানা-কুলা পব্বজিতা। তে সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং দূসেন্তি। হন্দ ময়ং, ভন্তে, বুদ্ধবচনং ছন্দসো আরোপেমা'তি।"

(সকনিরুত্তি অনুজাননা/ চুল্লবগ্গ/ বিনয়পিটক)

ভন্তে, ভগবন, আজকাল নানা নামের, নানা গোত্রের নানা জাতির মানুষ প্রব্রজ্যিত হয়ে সংঘভুক্ত হয়েছেন। তারা তাদের নিজ নিজ ভাষায় বুদ্ধবাণী বোঝেন, অধ্যয়ন করেন আর প্রচার করেন। এভাবে তারা পবিত্র বুদ্ধবাণীকে প্রদূষিত করে চলেছেন। ভন্তে, ভগবান, (আপনার নির্দেশ পেলে) আমরা বুদ্ধবাণী ছন্দসে (বৈদিক-সংস্কৃতের কাব্যিক রূপ) ভাষান্তরিত করব।

প্রস্তাব শুনতেই শাস্তা অসন্তুষ্ট হন। অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি বলেন- "কি করে তোমরা মূর্খের ন্যায় বলতে পারলে- 'আমরা ছন্দস্ ভাষায় বুদ্ধবাণী অধ্যয়ন আর প্রচার করবো।'

"বিগরহি বুদ্ধো ভগবা- কথং হি নাম তুম্হে, মোঘপুরিসা, এবং বক্খথ- "হন্দ ময়ং, ভন্তে, বুদ্ধবচনং ছন্দসো আরোপেমা'তি।"

(চুল্লবগ্গ/ বিনয়পিটক)

এরপর তিনি তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ স্পষ্ট করে বলেন-

"ছান্দসে বুদ্ধবাণী ভাষান্তরিত করে সুরক্ষিত রাখার নির্দেশ দেয়া হলে প্রসন্নগণের প্রসন্নতা কমবে বৈ বাড়বে না। অপ্রসন্নগণের অপ্রসন্নতা বাড়বে বৈ কমবে না। আগারিক জীবন ছেড়ে অনাগারিক জীবন বরণ করেছেন এমন প্রব্রজ্যিতগণের উচিত অপ্রসন্নগণের অপ্রসন্নতা কমিয়ে প্রসন্নতা সৃষ্টিতে, আর প্রসন্নগণের প্রসন্নতা বর্দ্ধনে সহায়ক হওয়া।

"দুব্ভরতায় দুপ্পোসতায় মহিচ্ছতায় অসন্তুট্ঠিতায় সঙ্গণিকায় কোসজ্জস্স অবণ্ণং ভাসিত্বা, অনেকপরিয়ায়েন সুভরতায় সুপোসতায় অপ্পিচ্ছস্স সন্তুট্ঠস্স সল্লেখস্স ধুতস্স পাসাদিকস্স অপচয়স্স বিরিয়ারম্ভস্স বণ্ণং ভাসিত্বা, ভিক্খুনং তদনুচ্ছবিকং তদনুলোমিকং ধম্মিং কথং কত্বা ভিক্খূ আমন্তেসি-"

"ন, ভিক্খবে, বুদ্ধবচনং ছন্দসো আরোপেতব্বং। যো আরোপেয়্য, আপত্তি দুক্কটস্স। অনুজানামি, ভিক্খবে, সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং পরিয়াপুণিতু'ন্তি।"

(সকনিরুত্তি-অনুজাননা/ চুল্লবগ্গ/ বিনয়পিটক)

"নেতং, মোঘপুরিসা অপ্পসন্নানং বা পসাদায়, পসন্নানং বা ভিয়্যোভাবায়, অথ খ্বেতং, মোঘপুরিসা, অপ্পসন্নানং চেব অপ্পসাদায় চ একচ্চানং অঞ্ঞথত্তায়াতি।"

(চুল্লবগ্গ/ বিনয়পিটক)

এর পর শাস্তা নানা প্রকারে দুভর, অল্পে তুষ্ট নন এমন ভিক্ষুগণের নিন্দা, আর সুভর ও অল্পে তুষ্ট ভিক্ষুগণের প্রশংসা করে কালোপযোগী ধর্মোপদেশ দেন।

"অথ খ্বেতং, মোঘপুরিসা, অপ্পসন্নানং চেব অপ্পসাদায় চ একচ্চানং অঞ্ঞথত্তাতায়। অথ খো ভগবা তে ভিক্খু অনেকপরিয়ায়েন বিগরহিত্বা,

দুব্ভরতায় দুপ্পোসতায় মহিচ্ছতায় অসন্তুট্ঠিতায় সঙ্গণিকায় কোসজস্স অবণ্ণং ভাসিত্বা, অনেকপরিয়ায়েন সুভরতায় সুপোসতায় অপ্পিচ্ছস্স সন্তুট্ঠস্স সল্লেখস্স ধুতস্স পাসাদিকস্স অপচয়স্স বিরিয়ারম্ভস্স বণ্ণং ভাসিত্বা ভিক্খূনং তদনুচ্ছবিকং তদনুলোমিকং ধম্মিং কথং কত্বা ভিক্খূ আমন্তেসি - ন, ভিক্খবে, বুদ্ধবচনং ছন্দসো আরোপেতব্বং। যো আরোপেয়্য, আপত্তি দুক্কটস্স।"

(চুল্লবগ্গ/ বিনয়পিটক)

ধর্মোপদেশের শেষে তিনি তাদেরকে দু পর্যায়ে নির্দেশ দেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি নিষেধাজ্ঞা জারি করে বলেন- "হে ভিক্ষুগণ, ছন্দসে বুদ্ধবাণী ভাষান্ত রিত করা উচিত হবে না। এ প্রবৃত্তিকে রুখতে তিনি দণ্ডাত্মক বিধান দিতেও কালবিলম্ব করেন নি। তিনি এ ব্যাপারে আদেশ জারি করে বলেন- যে এ কাজ করবে সে দোষণীয় দুস্কৃত (দুক্কট) আপত্তিতে দোষী হবে।"

এরপর তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ে স্পষ্ট নির্দেশ জানিয়ে বলেন-

"অনুজানামি, ভিক্খবে, সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং পরিয়াপুণিতু'ন্তি।"

(চুল্লবগ্গ/ বিনয়পিটক)

হে ভিক্ষুগণ, নির্দেশ দিচ্ছি- নিজ ভাষায় বুদ্ধবাণীর সংরক্ষণ করবে। শাস্তার ভাষা-সংক্রান্ত এ নির্দেশকে কেন্দ্র করে আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে তাঁর সমালোচনা করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। তাদের মতে শাস্তা সংস্কৃত জানতেন না। একারণেই হয়ত শাস্তাকে এ নির্দেশ দিতে হয়েছিল। কিন্তু এমন সমালোচনার কোন আধার নেই। বুদ্ধ তাঁর শৈশবকাল হতেই তদ্কালীন সংস্কৃতজ্ঞ, বেদজ্ঞ ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পারঙ্গত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সান্নিধ্যে বেদ অনুশীলন করেন। এ সবে তিনি নিপুণতা অর্জন করেছিলেন।

উপরোক্ত নির্দেশসূচক বাক্যের অন্তর্গত 'সকায় নিরুত্তিয়া' বাক্যাংশের অনুবাদকে কেন্দ্র করে আধুনিক সাহিত্যবিদ্গণ দু'ধরণের মত ব্যক্ত করেন।

কিছু বিদ্বানের মতে 'সকা নিরুত্তি' (নিজ ভাষা) বলতে ধর্মের ধারক, বাহক ও প্রচারক ভিক্ষুগণের নিজ নিজ (আঞ্চলিক) ভাষা বোঝায়। আর কিছু বিদ্বানদের মতে **'সকায় নিরুত্তিয়া'** (নিজ ভাষায়) বলতে শ্রোতাদের নিজ নিজ (আঞ্চলিক) শিষ্যদের সুবিধার্থে নিজ নিজ (আঞ্চলিক) ভাষায় বুদ্ধবাণী বোঝার বা বোঝানোর ভাষা-স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। নিজ নিজ (আঞ্চলিক) ভাষায় বুদ্ধবাণী বা অন্য কিছু বোঝার বা বোঝানোর অধিকার কাউকে দিতে হয় না। তা তো প্রত্যেকে জন্মাধিকার সূত্রেই পায়। প্রশ্নটি বুদ্ধবাণী বোঝার

বা বোঝানোর নয়। মূল প্রশ্নটি ছিল- বুদ্ধবাণীকে প্রদূষণ-মুক্ত রাখার। সংরক্ষণের ব্যাপারে সংরক্ষকগণকে সব প্রকারের স্বাধীনতা দেয়া হলে সংরক্ষণীয় তত্ত্বটি একেবারে অসুরক্ষিত হয়ে পড়ে। সুরক্ষার ব্যাপারে সব সংরক্ষককেই স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে সংকীর্ণ স্বার্থ ত্যাগ করে বৃহত্তর স্বার্থে আবশ্যিক-ভাবে কিছু না আবশ্যিক নিয়ম মেনে নিতে হয়। বুদ্ধবাণীকে প্রদূষণমুক্ত রাখার সাথে একে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখার উদ্দেশ্যে শাস্তাকে নিম্নলিখিত নির্দেশ দিতে হয়েছিল।

"অনুজানামি, ভিক্খবে, সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং পরিয়াপুণিতুং।"

উপরোক্ত নির্দেশের মর্মোদ্ধার করতে হলে এর ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। নিম্নলিখিত তিন বাক্যে উপরোক্ত নির্দেশের পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যেতে পারে-

(১) 'অনুজানামি, ভিক্খবে (তুম্হাকং) সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং পরিয়াপুণিতুং।'

[নির্দেশ দিচ্ছি, হে ভিক্ষুগণ, (আপনাদের) নিজ ভাষায় বুদ্ধবাণী সংরক্ষণ করবে।] কিন্তু শাস্তা তাঁর ঐ নির্দেশে **"তুম্হাকং"** শব্দের প্রয়োগ করেন নি।

(২) 'অনুজানামি, ভিক্খবে, (মম) সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং পরিয়াপুণিতুং।'

[হে ভিক্ষুগণ, (আমার) নিজ ভাষায় বুদ্ধবাণী সংরক্ষণের নির্দেশ দিচ্ছি।] তবে ঐ নির্দেশ-নামায় **'মম'** (আমার) শব্দের প্রয়োগ হয়নি। করা হলে বাক্যার্থ স্পষ্ট অবশ্যই হতো, তবে তা শ্রুতিমধুর হতো না। বুদ্ধের ন্যায় আর্যপুরুষগণ সাধারণত 'আমি' বা 'আমার' শব্দাদির প্রয়োগ প্রায়ই বর্জন করে থাকেন। কেবল লৌকিকতা রক্ষার্থে ওসব শব্দের প্রয়োগ করতেন তিনি বা তাঁরা।

(৩) 'অনুজানামি, ভিক্খবে, (বুদ্ধস্স বা বুদ্ধানং) সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং পরিয়াপুণিতুং।'

[হে ভিক্ষুগণ, (বুদ্ধের বা বুদ্ধগণের) নিজ ভাষাতেই বুদ্ধবাণী সংরক্ষণের নির্দেশ দিচ্ছি।]

বাক্যটিতে **'বুদ্ধস্স'** বা **'বুদ্ধানং'** কথাটি যুক্ত হলে হয়ত বাক্যার্থ অধিক স্পষ্ট হতো, তবে তা শ্রুতি-মধুর হতো না।

সার্থক ও শ্রুতিমধুর করতে হলে এর আর বিস্তারও করা যায় না, আবার এর চেয়ে অধিক সংক্ষিপ্তও করা যায় না।

কোন ব্যাপারেই বুদ্ধগণ স্বেচ্ছাচারিতা করেন না। কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে এক বুদ্ধ তাঁর পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের আদর্শকে দিব্যদৃষ্টিতে জেনে নেন। তাঁদের অনুসৃত পরম্পরাকে তিনিও অনুশরণ করেন। এভাবে বুদ্ধপরম্পরা সংরক্ষিত ও সম্বর্দ্ধিত হয়। গৌতম বুদ্ধের ভাষা-সংক্রান্ত নির্দেশনামার ব্যাপারেও ঐ নীতি সমান ভাবে প্রযোজ্য।

'সকা নিরুত্তি'র অর্থ (বুদ্ধগণের) 'নিজ ভাষা' রূপে করার আরেকটি কারণ রয়েছে। সেটি হল প্রতিটি প্রাণীর সাথে তার জন্ম-ভূমি ও কর্ম-ভূমির এক নিবিড় ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকে। পৃথিবী ও পৃথিবীতে (পৃথিবী হতে) সৃষ্ট সব সজীব ও অজীব তত্ত্বের মধ্যে এক অদৃশ্য আকর্ষণ শক্তি ক্রিয়াশীল রয়েছে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় একে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি বলা যেতে পারে। পৃথিবীর বিশালতর হতে বিশালতম আর ছোট ক্ষুদ্রতম অনু-পরমাণু আকারের তত্ত্বকে এ আকর্ষণ এমন ভাবে আকর্ষিত করে থাকে যেন তা তার কেন্দ্র বিন্দু হতে দুরে ছিট্‌কে না যায়। সৌরমণ্ডলের গ্রহ-নক্ষত্রের বেলাতেও এ আকর্ষণ সমানভাবে কাজ করে। প্রতিটি সৌরমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে নিজ নিজ কক্ষপথে ভ্রাম্যমান থাকে।

অনুরূপভাবে বুদ্ধগণের জীবনেও তাঁদের জন্মভূমি ও কর্মভূমি দুইই, আর বিশেষত জন্মভূমির আকর্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতীত ও বর্তমান, এবং বর্তমান ও অনাগত বোধিসত্ত্বগণ (বুদ্ধ) এক অদৃশ্য (ধর্মতা) সূত্রে আবদ্ধ থাকেন। এ ধর্মতাগুণে তাঁদের কেহই কোন কারণে বুদ্ধপরম্পরাকে ক্ষুণ্ন করেন না, বরংচ তাঁদের প্রত্যেকে এ পরম্পরাকে আরও সুদৃঢ় করে থাকেন।

সামান্যত লুম্বিনী-বন গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমিরূপে অতি চর্চিত। আসলে তা তো রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মভূমি। বুদ্ধের জন্মভূমি হল তাঁর বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূণ্যভূমি অর্থাৎ উরুবেলা। পরম্পরাগতভাবে উরুবেলা কেবল গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমি নয়, তা অতীতের সব বুদ্ধের জন্মভূমি। শুধু যে অতীত ও বর্তমান বুদ্ধগণের জন্মভূমি তা নয়, অনাগত-কালের বুদ্ধগণেরও তা জন্মভূমি হবে।

পরম্পরাগত এ সব মতকে আধুনিক ভাষাবিদ্‌গণ মান্যতা দিতে চান না। ভাষার ক্রম-বিকাশের পারিপার্শ্বিক কারণগুলোকে তাঁরা অধিক গুরুত্ব দেন। এ দৃষ্টিতে নিম্নলিখিত কারণে বুদ্ধের জীবনে যে মাগধী ভাষার প্রভাব পড়েছিল তা স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে।

গৌতম বুদ্ধ তাঁর বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর হতে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তির কাল অবধি বুদ্ধচরিয়া পালন করেন। বুদ্ধচরিয়া পালন-কালে পঁচিশটা বছর কোশল

জনপদের রাজধানী শ্রাবস্তীতে যাপন করেন। আর শেষ বিশটি বছর মগধের রাজধানী রাজগৃহ আর এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এবং মগধের পার্শ্ববর্তী জনপদে কাটান। মহাভিনিষ্ক্রমণের পর ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্বেও ছয় বছর মগধের নানা প্রান্তে কাটান। অধিককাল মগধে কাটানোর পরিণামে মাগধীভাষার প্রভাব যে তাঁর ভাষায় পড়েছিল এ বিষয়ে কারো কোন প্রকারের সন্দেহ থাকতে পারে না। তদুপরি সংঘ-স্থাপনার প্রারম্ভিক পর্যায়ে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের প্রত্যেকে মূলত কপিলবস্তুবাসী হলেও তাঁর উরুবেলায় দীর্ঘকাল একসাথে কাটিয়েছিলেন। সারনাথ হতে উরুবেলা ফিরে আসার পথে যশ প্রমুখ যে ছাপ্পান্নজন কুলপুত্র শাস্তার নবপ্রতিষ্ঠিত সংঘে দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁরাও মগধের প্রান্তবর্তী এলাকার নিবাসী হওয়ায় তাঁরা মাগধী-ভাষার সাথে নিশ্চয়ই পরিচিত ছিলেন। উরুবেলায় ফিরে আসার পর জটাবল্কলধারী যে তিন জটাধারী ভাই ও তাঁদের হাজার জটাধারী শিষ্য শাস্তার সান্নিধ্যে সংঘে দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁরাও প্রত্যেকে 'মাগধী নিরুক্তি'র সাথে সুপরিচিত ছিলেন।

উরুবেলা হতে রাজগৃহে ফিরে আসার পর মগধরাজ বিম্বিসার প্রমুখ অসংখ্য মগধবাসী শাস্তার নবপ্রচারিত ধর্মে প্রভাবিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন।

"অথ খো রাজা মাগধো সেনিয়ো বিম্বিসারো দ্বাদসনহুতেহি মাগধিকেহি ব্রাহ্মণ-গহ্-পতিকেহি পরিবুতো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি।"

বিম্বিসারসমাগমকথা/ মহাখন্ধকো/ মহাবগ্গপালি

মগধরাজ বিম্বিসারের তৈরী বেলুবনারামে অবস্থানকালে সারিপুত্র ও মোগল্যায়ন প্রমুখ অগণিত মগধবাসী ব্যক্তিগত ও সামূহিক ভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে বুদ্ধের শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন। অনেকে আগারিক জীবন ত্যাগ করে অনাগারিক জীবন বরণ করে সংঘ-শক্তিকে সুদৃঢ় করেছিলেন। রাজগৃহ হতে বৈশালী হয়ে কুশীনগর অভিমুখে শাস্তার শেষ যাত্রাকাল অবধি এ প্রক্রিয়া চলেছিল। এভাবে মগধ জন্মভূমি ও কর্মভূমি হওয়ায় 'মাগধী নিরুক্তি'র (ভাষা) প্রভাব অবশ্যই শাস্তার ভাষাকে যে প্রভাবিত করেছিল তা ভাষা-বিজ্ঞান-সম্মত-ভাবেও বলা যায়।

বুদ্ধের মধ্যম মার্গ ও তাঁর ভাষা: বুদ্ধগণ তাঁর সম্বোধি-দীপ্ত সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের বুদ্ধচর্যাকালে, এমন কি তাঁর জন্মলগ্নেও অজান্তে কিছুই করেন না। তিনি বা তাঁরা যা করেন সব জেনে শুনেই করে থাকেন। পূর্বাপর ভালমন্দ বিচার করার পর যা তর্কসংগত হয়, আর যাতে বহুজনের হিতসাধিত হয়,

এমন কাজই তাঁরা করেন। মধ্যম মার্গ অবলম্বন ব্যতীত আর কোন অতিবাদী মার্গে বহুজনের হিতসাধন করা সম্ভব নয়। তাঁর ভাষা-সংক্রান্ত নীতি-নির্দ্ধারণেও নিশ্চয়ই ঐ মধ্যম মার্গের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকে থাকবে।

বুদ্ধকালীন ভারতীয় সমাজে (উপরোক্ত জনপদগুলোতে) সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। এ দুয়ের মধ্যে বিভিন্নকালের সংস্কৃত ভাষায় সামান্য বিবিধতা থাকলেও মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে ওসবে একরূপতা ছিল। সংস্কৃত-বর্জিত প্রাকৃত শ্রেণীভুক্ত ভাষা গুলোতে একরূপতা ছিল না। প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ভাষার নিজস্ব ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিল। 'প্রাকৃত' কোন এক ভাষাবিশেষের নাম নয়। এটি ছিল তদ্‌কালীন আঞ্চলিক ভাষাগুলোর এক সামূহিক নাম। এর অন্তর্গত ভাষাগুলোর মধ্যে 'মাগধী' ও 'অর্ধ-মাগধী' দুটি ভাষা অন্য ভাষা অপেক্ষা অধিক জনপ্রিয় ছিল। আবার এ দুয়ের মধ্যে 'মাগধী' 'অর্দ্ধ-মাগধী' অপেক্ষাও অধিক জনপ্রিয় ছিল। 'অর্দ্ধ-মাগধী' ভাষায় জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর 'জিন' তাঁর ধর্মপ্রচার করেছিলেন। কাজেই ভগবান বুদ্ধ তাঁর উদ্দেশ্য-পূর্তিতে সংস্কৃত ও অর্দ্ধ-মাগধীকে বাদ দিয়ে মধ্যম মার্গ অবলম্বন করে মাগধী ভাষাকে ধর্মপ্রচারের মান্যতা দেন। এছাড়া বহুজনের হিত-সাধন করার আর কোন অন্য মাধ্যমের বিকল্প তাঁর সম্মুখে ছিল না।

বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পরক্ষণ হতে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তির পূর্বক্ষণ অবধি মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছর বুদ্ধচর্যা-কালে যে অমৃতবাণী প্রচার করেছেন তাকে সঙ্গীতিকারক ভিক্ষুগণ নানাভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। এক দৃষ্টিতে বুদ্ধবাণীকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। ঐ তিনটি হল- (১) প্রথম বুদ্ধবাণী, (২) মধ্যম বুদ্ধবাণী ও (৩) অন্তিম বুদ্ধবাণী।

প্রথম বুদ্ধবাণী: দুষ্কর ত্যাগ-তিতিক্ষাময় তপ-তপস্যার (পর) চির প্রতীক্ষিত বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর গৌতম বুদ্ধ নিম্নলিখিত উদান-গাথা উচ্চারণের মাধ্যমে তাঁর মানসিক শান্তি ও প্রীতি-ভাব ব্যক্ত করেছিলেন-

"অনেকজাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং,
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং।"

(ধম্মপদ/গাথা-১৫৩)

"গহকারক, দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি,
সব্বা তে ফাসূকা ভগ্গা গহকূটং বিসঙ্খিতং;
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্ঝগা'তি।।"

[ধম্মপদ-ভাণকা পন ইদং 'পঠম-বুদ্ধবচনং নামা'তি বদন্তি।]

ধর্মপদ-ভাণকদের মতে এটি প্রথম বুদ্ধবাণী।

অন্তিম বুদ্ধবাণী: কুশীনগরের যমক শাল-বৃক্ষের মূলের মধ্যবর্তী ভূভাগে শেষ বারের মতো শয্যাশায়ী হয়ে তাঁর মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তির প্রাক্কালে উপস্থিত ও অনুপস্থিত, নিকট ও দূরস্থ, দৃশ্য ও অদৃশ্য সবার হিতে ও সবার সুখে শেষ উপদেশ শুনিয়ে বলেছিলেন-

"হন্দ দানি, ভিক্খবে, আমন্তয়ামি বো,
বয়ধম্মা সঙ্খারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথা'তি।।"

[মহাপরিনিব্বাণসুত্ত/দীঘনিকায়]

মধ্যম বুদ্ধবাণী: উপরোক্ত দুই কালে উচ্চারিত প্রথম বুদ্ধবাণী ও অন্তিম বুদ্ধবাণীরূপে শ্রেণীভুক্ত বুদ্ধবাণীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ধর্মচক্রপ্রবর্তনাদি সব বুদ্ধবাণীকে 'মধ্যম-বুদ্ধবাণী'-রূপে শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

"উভিন্নমন্তরে পঞ্চচত্তালীসবস্সানি পুপ্ফদামং গণেহন্তেন বিয়, রতনাবলিং আবুণন্তেন বিয়, চ কথিতো অমতপ্পকাসিনো সদ্ধম্মো মজ্ঝিম-বুদ্ধবচনং নাম।"
[নিদানকথা/অট্ঠসালিনী]

বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থের উচ্চারিত প্রথম বাণী, এবং তথাগত বুদ্ধের বুদ্ধচর্যাকালে তাঁর উচ্চারিত উপরোক্ত তিন শ্রেণীর বুদ্ধবাণীর ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণ-শাস্ত্র-সম্মত বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে তাঁর বাচন-শৈলীর সরলতা, আর তার সাথে জানা যাবে তাঁর ভাষার সরলতা। তাঁর ভাষার আদিতে, মধ্যে ও অন্তে রয়েছে একই তাল, একই লয় ও একই স্বচ্ছন্দতা। এ বিশেষতাই 'মাগধী ভাষা'কে অন্য সব আঞ্চলিক ভাষাসমূহ হতে বিশেষিত করেছে।

এ ছাড়াও পরম্পরাগতভাবে অর্থাৎ শাস্ত্র-সম্মত-ভাবে বলা যায় 'মাগধীভাষা' শুধু বর্তমান গৌতম বুদ্ধের ভাষা ছিল না। অতীত, আগত ও অনাগত বুদ্ধগণের প্রত্যেকের জন্ম ও কর্ম ভূমি হওয়ায় গৌতম বুদ্ধের পূর্বাপর সব বুদ্ধের ভাষা হয় 'মাগধী ভাষা'। তাঁদের 'নিজ ভাষা' (**সকা নিরুত্তি**) বলতে 'মাগধী ভাষা'ই বোঝায়।

মূল-ভাসা: জম্বুদ্বীপের মধ্যম মণ্ডলে জাত মানবের আদিভাষা অর্থাৎ শৈশব-কালীন ভাষা, অর্থাৎ জীবনে অন্য ভাষা শেখার পূর্বে এ ভাষায় মানব-সন্তান কথা বলা শেখে। শুধু মানবকুল-নয় যক্ষ-রক্ষ, ভুত-প্রেত ও দেব-ব্রহ্মারাও এ ভাষাতে কথা বলেন। বুদ্ধগণও এভাষায় তাদের সঙ্গে বার্তালাপ করতেন।

"সা মাগধী মূলভাসা নরা য়ায়াদিকপ্পিকা,
ব্রাহ্মণো চ'স্সুতালাপা, সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে।"

নামকণ্ড/ পদরূপসিদ্ধি

একারণে 'মাগধী ভাষা'কে 'মূল ভাষা'ও বলা হয়।

অরিয়-ভাসা: আর্য পুরুষগণ তাঁদের জীবনে একাধিক ভাষায় দক্ষতা অর্জন করলেও তাঁরা মাগধী ভাষাকেই নিজ ভাষা (**সকা নিরুত্তি**) রূপে মনে করেন। একারণে এভাষাকে 'আর্য ভাষা'ও বলা হয়।

পালি-ভাসা: মাগধী ভাষাতেই বুদ্ধবচন মূলরূপে সংরক্ষিত (পালিত) হওয়ায় (**বুদ্ধবচনং পালেতীতি পালি**) একে 'পালি ভাষা'ও বলা হয়।

ধম্ম-নিরুত্তি: তথাগত বুদ্ধ দেশিত ধর্ম (**ধম্ম**) 'মাগধী নিরুক্তি'-তেই সংরক্ষিত হওয়ায় একে 'ধর্ম নিরুক্তি'ও বলা হয়।

"তত্র ধম্মনিরুত্তাভিলাপে ঞাণন্তি। তস্মিং অত্থে চ ধম্মে চ যা সভাবনিরুত্তি অব্যভিচারী তব্বোহারো, তদভিলপেতস্স ভাসনে উদীরণে, তং ভাসিতং লপিতং উদীরিতং সুত্বা ব অয়ং স্বভাব-নিরুত্তি, অয়ং ন স্বভাব-নিরুত্তী'তি এবং তস্মা ধম্ম-নিরুত্তি সঞ্ঞিঞতায় সভাবনিরুত্তিয়া মাগধিকায় সব্বসত্তানং মূলভাসা- পভেদগতং ঞাণং নিরুত্তিপটিসম্ভিদা।"

(বিনয়-অট্ঠকথা)

সভাব-নিরুত্তি: মাগধী নিরুক্তিকে শিখতে মানবকে বিশেষ কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। এ কারণে একে স্বাভাবিক ভাষা বলা হয়। তাকে মায়ের কোলে শিশুর, আর প্রকৃতি কোলে প্রাণীর প্রাকৃতিক ভাষা শেখার কারণে প্রাণীদের শেখা স্বাভাবিক ভাষাকে 'স্বভাব- নিরুক্তি' বলা হয়। এ ভাষাই বুদ্ধগণের স্বাভাবিক নিরুক্তি।

"সভাব-নিরুত্তিং জাননত্তান'ন্তি মাগধ-ভাসং জানন্তানং। মাগধ-ভাসাহি মূল-ভাসাতি চ অরিয়ভাসাতি চ মাগধ-ভাসাতি চ পালি-ভাসাতি চ ধম্ম-নিরুত্তী'তি চ সভাব-নিরুত্তী'তি চ বুচ্চতি।"

সম্মাসম্বুদ্ধপদ/ অনুদীপনীপাঠ

উপরোক্ত পর্যায়বাচী (প্রতিশব্দ) শব্দসমূহের মধ্যে বর্তমানে 'পালি-ভাষা' (পালি-ভাষা) শব্দটি বুদ্ধের ভাষা ও ত্রিপিটকের মূল ভাষারূপে সর্বাধিক প্রচলিত।

আর্চায বুদ্ধঘোষের কাল অর্থাৎ প্রায় চতুর্থ শতাব্দী হতে মূল বুদ্ধবাণীকে 'পালি' সংজ্ঞায় অভিহিত করার পরম্পরা প্রচলিত হয়। তিনি তাঁর অর্থকথা সাহিত্যে ত্রিপিটক সাহিত্য হতে উদ্ধৃত 'মূল বুদ্ধবাণী'কে বিশেষিত করার উদ্দেশ্যে একাধিক স্থলে **'অয়মেত্থ পালি'** বা **'পালিমত্তং ইধানীতং'** অথবা **'পালিয়ং বুত্তং'** অথবা

"অয়ং পন নয়ো, নেব পালিয়ং ন অট্ঠকথায়ং দিস্সাতি।"

তেভূমককুসলবণ্ণনা/ ধম্মসঙ্গণি-অট্ঠকথা

"নেব পালিয়ং ন অট্ঠকথায়ং আগতং"

চরিয়াবণ্ণনা/ বিসুদ্ধিমগ্গো - ১

কথার উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে পালি ভাষায় রচিত সম্পূর্ণ পিটকেতর অর্থকথা টীকা, অনুটীকা, যোজনা, দীপনী, বংশকথাদি সাহিত্যকে 'পালি' বলার পরম্পরা প্রচলিত হয়।

স্থবিরবাদী বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক ও এর বিস্তারিত সাহিত্যের ভাষা আজ 'পালি ভাষা', আর এ ভাষায় রচিত বিশাল সাহিত্য 'পালি সাহিত্য' নামে খ্যাতি পেয়েছে। কাজেই বুদ্ধের নিজ ভাষা (সকা নিরুত্তি) জানতে হলে পালি ভাষা ও পালি সাহিত্যের অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক।

"অক্খরমেকমেকং চ, বুদ্ধ-রূপসমং সিয়া।
তস্মা হি পণ্ডিতো পোসো, লিখেয়্য পিটকত্তয়ং।"

ক্রমিক নং	জনপদ	রাজধানী	ভাষা প্রচলিত ছিল
১।	অঙ্গ	চম্পা	মাগধী
২।	মগধ	রাজগৃহ	,,
৩।	কাশী	বারাণসী	,,
৪।	কোশল	শ্রাবস্তী	,,
৫।	বজ্জী	বৈশালী	,,
৬।	মল্ল	পাবা (কুশিনারা)	,,
৭।	চেতী	সোত্থিবতী	,,
৮।	বৎস (বংস)	কৌসম্বী	,,
৯।	কুরচ	ইন্দ্রপস্থ	,,
১০।	পাঞ্চাল	কাম্পিল্ল্য	,,
১১।	মৎস্য	বিরাটনগর	,,
১২।	সূরসেন	মথুরা	,,
১৩।	অস্‌সক (অশ্মক)	পোতলা	,,
১৪।	অবন্তী	উজ্জয়িনী	,,
১৫।	গন্ধার	তক্ষশিলা	,,
১৬।	কম্বোজ	দ্বারকা	,,

সহায়ক-গ্রন্থ-সূচী

১। অট্‌ঠসালিনী (ধম্মসঙ্গনী-অট্‌ঠকথা)

২। দীঘনিকায়- অট্‌ঠকথা

৩। ধম্মপদ অট্‌ঠকথা

৪। চুল্লবগ্গ (বিনয়-পিটক)

৫। নিদানকথা (জাতক-অট্‌ঠকথা)

৬। ভগবান বুদ্ধ, ধর্মানন্দ কোসম্বী সাহিত্য অকাদেমী, নতুন দিল্লী - ১৯৮০

৭। মহাবগ্গ (বিনয়-পিটক)

৮। বিভঙ্গ-অট্‌ঠকথা (অভিধম্ম-পিটক) Chattha Sangayana CD-Rom Version 3 Published by Vipassana Research Institute, Dhammagiri Igatpuri, Maharashtra - 422403

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নাম ঃ ড. ভিক্ষু সত্যপাল
পিতার নাম ঃ ঁবিনোদ বিহারী বড়ুয়া
মাতার নাম ঃ শ্রীমতী যুথিকা রাণী বড়ুয়া
জন্ম স্থান ঃ হলদিবাড়ী চা বাগান
জলপাইগুড়ি (প. ব.)
জন্ম তারিখ ঃ ০১. ০৩. ১৯৪৯

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ত্রিপিটক বিশারদ (স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত)
এম. ফিল., পি. এইচ. ডি. (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়)

পেশা ঃ অধ্যাপনা, বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগ
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮১ হতে -)

বর্তমানে ঃ বিভাগীয় প্রধান

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ (০১) তেলকটাহগাথা (বঙ্গানুবাদ সহ)
(০২) খুদ্দক-পাঠ (ইংরেজী ও হিন্দী অনুবাদ সহ)
(০৩) কচ্চায়ণ-ন্যাস (১ম ভাগ)
(০৪) ধম্ম-সংগহ (১ম ভাগ)
(০৫) বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর,
(০৬) বৌদ্ধ ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজ
(০৭) শরণ-গ্রহণের পরম্পরা
(০৮) বুদ্ধের দিব্যদৃষ্টি ও আজীবক উপক
(০৯) জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথা
(১০) ক্ষুদ্রক-পাঠ

গ্রন্থ-সম্পাদনা ঃ (০১) 'মৈত্রী' স্মরণিকা (১৯৮২)
(বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন, দিল্লী)
(০২) 'ভিক্ষু-পরিবাস' স্মরণিকা (১৯৮৯)
(ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা)।
(০৩) 'ধম্মচক্কং' স্মরণিকা (১৯৯৩ - ২০০৫)
(বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন, দিল্লী)
(০৪) 'The Buddhist Studies' – Journal of Department of Buddhist Studies University of Delhi, Delhi - 110007

প্রকাশনার অপেক্ষায় (গ্রন্থ ও নিবন্ধ) ঃ ১৫ টির পাণ্ডুলিপি তৈরী
(বাংলা, ইংরেজী ও পালি ভাষায়)

ধর্মালংকার ভিক্ষু, নব নালন্দা ডিম ইউনিভারসিটি

3. Buddher Bhāsā (The Language of the Buddha)

After Enlightenment the Buddha delivered his first discourse at Ishipatana, present Sarnāth, to his former five disciples popularly known as Panchvargiya Bhikkhus. That discourse is popularly known as *Dhammachakkapabbatan sutta*. Since then for 45 years without any rest the Buddha preaches his *Dhamma* up to the time of his last breath. Entire teaching is preserved in the form of Tripitaka. He founded his *Sangha* at Ishipatana and at a time number of Arahant monks disciples reached up to 60. He asked his disciples not to take rest in any place for long time but to preach his *dhamma*, which is good in the beginning, good in the middle and even good in the end. He asked the monk not to follow one and the same way but to take different way to reach different directions. At one stage some monks who were from Brahmin families, with all traditional teaching preserved in Chandas language. In order to preserve the purity of the Buddha Vachana thought to, preserve those Buddha vachana in their Chandas language only. With this idea in the mind those two Brahmin Bhikkhus went to the Buddha and sought the permission to put his teaching into Chandas language instead of preaching in local or regional language. The Buddha immediately rejected their proposal and asked them, and the Sangha as well, to preach his

Dhamma in own language (Sakaaya niruttiyaa). The term *sakā nirutti* has been interpreted by different scholar in different ways, contradicting each other and creating more confusion among the student researchers of the present time. In order to remove this confusion the author of this book Bhikkhu Satyapāla has written this book on the basis of the original sources that is Pali Tripitaka literature, which is regarded as earliest Buddhist scriptures. In order to prove his statements he has quoted several Pāli quotations from the Pitika literature and the commentaries.

The author of this book is of the opinion that although Buddha was born in Lumbini as a baby but his actual birth place was Urvela, situated at Magadha Kingdom, the place where he attained *Sambodhi*. Before attainment of his *Sambodhi* he spent maximum time in Magadha region for many years, and after attainment of his *Sambodhi* he also spent maximum years at Magadha region. At the early stage of preaching *dhamma* maximum numbers of his followers were from the Magadha kingdom. The first king who became disciple of the Buddha was also from Magadha, his name was Bimbisāra.

The middle land (Majjhimadesa) of the time of the Buddha was divided into many Janapadas, among those, Magadha was one of the most prominent and powerful Janapada. It is needless to mention here that apart from Sanskrit language each Janapada had several regional

languages. Those non-Sanskrit regional languages were collectively known as Prakrit language. Sanskrit language was highly grammertize and ornamented one. This language was used only in institutions and the royal offices controlled by the Brahmin and very few educated persons. Their percentage may be 5% to 8%, and rest 95% people of the all Janapada because of many reasons, especially religious rigidity, could not use Sanskrit. The common men were not allowed to learn Sanskrit. So, the majority of the populations were compelled to use a language totally different from Sanskrit, that which is very natural to them. This language was Prākrit language. Some scholars think that the Buddha did not know Sanskrit language so he rejected it, some thought that the Buddha was *anti-vedic* therefore he rejected Sanskrit. The Buddha was well versed in Sanskrit then why he rejected the Sanskrit or Chandas language. He rejected the Sanskrit or the Chandas language because it was out of reach of common people. Like other Janapadas, the people of Magadha they have several options of language, like Sanskrit and the Prākrit. Among the Prākrit language, Māgadhi and Ardha-Māgadhi were the popular one. Out of this two Prākrit language and Ardha-Māgadhi was already used by Jainas for preaching their religion. This Ardha-Māgadhi language was a kind of difficult language than the Māgadhi. So, the Buddha has only one options to avoid the Sanskrit on the one hand and Ardha-Māgadhi on the other, they being difficult. So, the Buddha was left with one choice. He had avoided both extreme and

difficult languages. He adopted Māgadhi language which was the more popular language of the people of Māgadh. Moreover, Māgadhi language was also popular in other surrounding Janapadas such as Vaishāli, Champa, Kosala, etc. and when the Buddha mentions *sakā nirutti* it means the Māgadhi *nirutti* only. He had no intention to introduce a new language to preach his *dhamma*, because this would create a new problem to the listener in learning and understanding the *dhamma*.

Moreover, he never uses the language of his own family, own Sākkayan family. When Buddha mentions *Sakā nirutti* it refers to the language of the Buddhas. All the Buddhas use Māgadhi language; they preach the *dhamma* in Māgadhi language of their respective time. Out of six great councils the finalized and approve the Tripitaka as the Buddha *vachana*, the first and the third council were held in Magadha, first one was in Rajagraha and the third one was in Pataliputra, whereas the second one was held in Vaishāli. Entire Tripitakas were compiled in Māgadhi language and that continued in oral traditions. Latter on, the literature written in Māgadhi language came to be known as Pāli language, since it has protected the Buddha *vachana* in true and pure form. This is them of the text.

"Wherever the Buddha's teachings have flourished,

either in cities or countrysides,

people would gain inconceivable benefits.

The land and people would be enveloped in peace.

The sun and moon will shine clear and bright.

Wind and rain would appear accordingly,

and there will be no disasters.

Nations would be prosperous

and there would be no use for soldiers or weapons.

People would abide by morality and accord with laws.

They would be courteous and humble,

and everyone would be content without injustices.

There would be no thefts or violence.

The strong would not dominate the weak

and everyone would get their fair share."

~THE BUDDHA SPEAKS OF
THE INFINITE LIFE SUTRA OF
ADORNMENT, PURITY, EQUALITY
AND ENLIGHTENMENT OF
THE MAHAYANA SCHOOL~

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

*** The Vows of Samantabhadra ***

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

*** The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra ***

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.
May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

《孟加拉文：BUDDHER BHASA(THE LANGUAGE OF THE BUDDHA), 佛陀的語言》

財團法人佛陀教育基金會 印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓
Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website: http://www.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

Printed in Taiwan
7,000 copies; April 2013
BA047 - 11147